একাত্তরের গণহত্যার স্বীকৃতি এখন সময়ের দাবি

হরিদাস ঠাকুর

বাংলাদেশে ২০১৭ সালে ১১ মার্চ জাতীয় সংসদে ২৫ মার্চকে জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। সেই সময় থেকে ২৫ মার্চ বাংলাদেশে জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা ইতিহাসের এক কলংকজনক অধ্যায়। এটি বাঙালির প্রতি চরমতম নিষ্ঠুরতার এক কালো অধ্যায়। ১৯৭১ সালের গণহত্যাকে হলোকাস্টরে পর ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম গণহত্যা হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিশ্বমানবতার নৈতিক ও আইনি দায়বদ্ধতায় এ ইতিহাসের যথাযথ স্বীকৃতি এখন সময়ের দাবি ।

গণহত্যা ও নৃশংসতা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধ এবং বাংলাদেশ নিজের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা থেকেই তার সাক্ষী। একাত্তরে বাঙালিদের ওপর যে নৃশংস হত্যাকান্ড, খুন, ধর্ষণ করা হয়েছিল, তা ১৯১৫ সালে অটোমান তুর্কিদের হাতে আর্মেনীয়, ১৯৭৫ সালের কম্বোডিয়ার গণহত্যা, ১৯৯২ সালের বসনিয়া ও ১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডায় তুতসি জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণহত্যার চেয়ে কম ছিল না। এমনকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চার-পাঁচ বছরের ব্যবধানে ইউরোপে ৬০ লাখ ইহুদি হত্যাকান্ডের চেয়েও ভয়াবহ ছিল মাত্র ৮ মাস ২০ দিনে ৩০ লাখ বাঙালিকে পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞের ঘটনা।

১৯৭১ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, মানবসভ্যতার ইতিহাসে যতগুলো গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, তার বিপরীতে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১১ হাজার পাঁচশতেরও বেশি বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে, যা গণহত্যার ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক সিডনি এইড শানবার্গ যুদ্ধের পরপর বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন, যা ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল, 'Bengalis' Land a Vast Cemetery, যার বাংলা অর্থ হচ্ছে, 'বাঙালির ভূখন্ড এক বিশাল সমাধিক্ষেত্র'। প্রতিবেদনের শিরোনাম দেখে গণহত্যার ব্যাপকতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার বিপরীতে আমরা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত নৃশংস গণহত্যার চিত্র তুলে ধরতে পারি। শ্রদ্ধেয় ইমরুল কায়েস এর জবানীতে এ ধরনের দুটি ঘটনার তথ্য পাওয়া যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির পক্ষে যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং মুক্তধারা প্রকাশিত 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' নামক গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণে। প্রথম ঘটনা হলো: 'মায়ের সন্তান খোঁজা: পাশের একটি গ্রাম থেকে একটি আধা বয়েসি মহিলা প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন। অবিন্যস্ত বেশবাস, খালি পা, চোখে এক নিদারুণ হতাশার দৃষ্টি। দলের ভেতরে বাচ্চাগুলোর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন এক এক করে। কিছুক্ষণ মাত্র। তারপর আবার ফিরে গেলেন অর্ধ-দগ্ধ গ্রামটির দিকে। সেই গ্রামেরই অন্য একজন সীমান্ত যাত্রীর কাছ থেকে ঘটনাটা শুনলাম। আগের দিন বিকেলে ঘুম পাড়িয়ে তিনি বাইরে গিয়েছিলেন। হঠাৎ মিলিটারি আসে এবং ঘরে ঘরে ঢুকে তারা লুটপাট অত্যাচার চালাতে থাকে। তিনি একটি ঝোঁপের ভেতরে লুকিয়ে ছিলেন। যখন মিলিটারিরা তাঁর ঘর জ্বালিয়ে দেয় তখন বোধ হয় ঘুমন্ত ছেলের কথা ভেবে তিনি আর থাকতে পারেননি, সম্ভবত বাইরে আসবার চেষ্টা করেছিলেন। মিলিটারিরা তাঁকে দেখে নারকীয় উল্লাসে চিৎকার করে উঠে। মর্মান্তিক অত্যাচার হয় তাঁর উপর। অনেক পরে গ্রামবাসীরা যারা ভয়ে সরে গিয়েছিল তারা ফিরে এসে সেই ঝোপের ভেতরেই তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখতে পায়। এবং তারাই সেবাশশুষা করে তাঁকে একটু সুস্থ করে তুলে। প্রথমেই তিনি জানতে চান তাঁর ছেলের খবর। অনেক ছাই এবং পোড়ামাটি সরানোর পর একটি বালকের বিকৃত অর্ধ-দগ্ধ দেহ পাওয়া গেল। তারপর থেকেই তিনি প্রায় অপ্রকৃতিস্থ। তিনি বিশ্বাস করেননি যে, সেই মৃতদেহ তাঁর ছেলের। এবং সেই থেকে অনবরত তিনি খুঁজছেন ছেলেকে। কখনো ছুটে বেরিয়ে আসেন পথে এবং চলমান যাত্রীদের ভেতরে খোঁজেন কিছুক্ষণ, আবার তারপরেই ফিরে যান নির্জন গ্রামের ভেতরে। শূন্য বাড়িগুলোর আনাচে, ঝোপে-ঝাড়ে খুঁজে দেখেন, ডাকেন ছেলের নাম ধরে, যেন সে কোথাও লুকিয়ে আছে, বেরিয়ে আসবে হঠাৎ কোন আড়াল থেকে। (পৃষ্ঠা নং: ৮৫-৮৬)

দ্বিতীয় ঘটনাটিও মর্মান্তিক। 'ভাইয়ের করুণ মৃত্যু' শিরোনামের ঘটনায় জানা যায়: ১৩ ই এপ্রিল, ১৯৭১। রাজশাহীর সরদহ অঞ্চলের সীমান্তবর্তী নদীর ভেতরে একটি চর। ভীত গ্রামবাসীরা সপরিবারে চলে আসছেন ভারতের দিকে, ভারত সীমান্ত এখনও কয়েক

মাইল দূরে। তাঁরা যে গ্রামে ছিলেন সেটা সরদেহের অন্তর্গত হলেও ভেতরের দিকের একটি গ্রাম এবং সেই জন্যই তাঁরা কিছুটা নিশ্চিত ছিলেন। ভেবেছিলেন, মিলিটারিরা হয়তো সরদেহের উপর দিয়েই চলে যাবে, ভেতরে আসবে না এবং সেই জন্যই তাঁরা পালাননি, গ্রামেই ছিলেন। কিন্তু মিলিটারি এল এবং যখন এল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। পালাবার পথ বন্ধ। কারণ চর এলাকা তখন মিলিটারির দখলে। অবশ্য তাঁরা তখনও সেটা জানতেন না। ভীত চকিত গ্রামবাসীরা, আবালবৃদ্ধবনিতা, চিরকালের ঘরবাড়ি ছেড়ে শুধু প্রাণ হাতে নিয়ে পথে নামলেন। চরের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা শুনতে পেলেন তাঁদের গ্রামের ভেতরে রাইফেলের ইতস্তত আওয়াজ। ততক্ষণে লুটপাট শুরু হয়ে গেছে, হৈ হল্লা আওয়াজ ভেসে আসছে এবং কিছু কিছু ঘরবাড়ি জ্বলছে ইতিমধ্যেই। হঠাৎ চরের ভেতরে একটি মিলিটারি ঘাঁটির সামনে পড়ে গেলেন তাঁরা। এই অসহায় শরণার্থী দলের উপরে পরপর নির্বিচারে গুলি চলল। লুটিয়ে পড়লেন অগণিত নারী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ এবং শিশু। এই দলের থেকে একমাত্র জীবিত যিনি আসতে পেরেছিলেন তিনি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি পরে মুক্তিফৌজে যোগ দিয়েছেন। তাঁকে জীবীত দেখে যে লোকটি তাঁর দিকে রাইফেল তুলেছিল, তিনি হঠাৎ তাকে অনুনয় করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দুতে বললেন,দেখ, তোমরা তো আমাদের সবাইকে মেরে ফেললে। আমার বাবা মা ভাই বোন সবাইকে। এখন আমিই আমাদের পরিবারে একমাত্র বেঁচে আছি। তা আমাকে মেরো না, আমাকে ছেড়ে দাও। তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো তাদের হাবিলদারের কাছে। সেখানেও তিনি অনুনয়-বিনয় করে বললেন। তারপর গুলিবিদ্ধ দেহগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করতে বলা হলো তাঁকে। লোকগুলো এখনো মরেনি অনেকে। অনেকেই যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। তাঁর একমাত্র ছোটো ভাইয়ের দেহ তিনি যখন টেনে নিয়ে যান তখন সে কাতর দৃষ্টিতে চেয়েছিল তাঁর চোখের দিকে। তার পায়ে গুলি লেগেছিল।

পেট্রোল আনা হলো। দেহগুলো সে একাই টেনে স্তূপীকৃত করল এবং তাদের মতলব বুঝতে পেরে জীবীত ছোটো ভাইকে সে রাখল স্তূপের নিচে। তারপর আগুন ধরিয়ে দিয়ে মিলিটারিরা চলে যায়। ছেলেটি ভারতে এসে এপার থেকে কয়েকজন লোক নিয়ে সেই রাত্রেই আবার ফিরে যায় চরে। স্তূপীকৃত দেহগুলোর ভেতর থেকে খুঁজে খুঁজে বার করে তার আব্বা, আম্মা এবং ছোটো বোনগুলোর দেহ। একটি কবর খুড়ে অর্ধদগ্ধ দেহগুলো সমাধিস্থ করা হয়। কিন্তু সে তার ভাইয়ের দেহ খুঁজে পায়নি! সেখান থেকে অল্প কিছু দূরেই তাদের বাড়ি। ছেলেটি তখন মরিয়া। রাতের অন্ধকারে সে তারপর বাড়িতে ফিরে যায় এবং সেইখানে সে তার ভাইয়ের মৃতদেহ আবিষ্কার করে। ঘরের চৌকাঠের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে দেহটা। অতিরিক্ত রক্তপাতে প্রায় ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এবং সেখানেই মারা গেছে সে।এই বীভৎস স্মৃতি নিয়ে সে তারপর ফিরে আসে এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দেয়। (প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা নং: ৮৬-৮৭)

২৫ মার্চ ২০২৪ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশনের নির্বাহী পরিচালক এলিসা ভন ফরগে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে ‘পলিটিকস অব জেনোসাইড রিমেমবারেন্স’ শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতায় বলেছেন, বিশ্বে গণহত্যা বন্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় গণহত্যার স্বীকৃতি এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। পাকিস্তান কখনো বাংলাদেশে গণহত্যায় তাদের দায় স্বীকার করেনি। শুধু তা—ই নয়, সে সময়ে পাকিস্তানের সমর্থক ও মিত্ররাও বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র তাদের দায় এড়াতে সক্ষম হয়েছিল। গণহত্যার মতো অপরাধের বিচারের গুরুত্ব তুলে ধরে এলিসা বলেন, গণহত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচার এবং জবাবদিহি না হলে ভবিষ্যতে তাদের আবারও এ ধরনের কাজে জড়ানোর আশঙ্কা তিন গুণ বেশি থাকে।

লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশনের পরিচালক বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষ মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি জঘন্য গণহত্যার শিকার হয়েছে। ৩০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এক কোটির বেশি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। ২ থেকে ৪ লাখ নারী ধর্ষণের শিকার হন। যখন পশ্চিম পাকিস্তানিরা যুদ্ধে হেরে যাচ্ছিল, তখন তারা ডিসেম্বরে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। বাংলাদেশে যুদ্ধ চলাকালে অনেক সাংবাদিক ‘জেনোসাইড’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৭২ সালে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টসের প্রতিবেদনে বলা হয়, এখানে ‘অ্যাক্টস অব জেনোসাইড’ সংঘটিত হয়েছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি গণহত্যার স্বীকৃতি শুধু দাবি নয়; এটা বাঙালিদের যৌক্তিক অধিকার; আর বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নৈতিক দায়িত্ব। ইতোমধ্যে একাত্তরে বাংলাদেশিদের উপরে পাকিস্তানিদের নির্মম হত্যাযজ্ঞকে ‘জেনোসাইড’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান ‘লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন’, আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘জেনোসাইড ওয়াচ’ এবং গণহত্যা বিশেষজ্ঞদের আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব জেনোসাইড স্কলার্স (আইএজিএস)।

১৯৭১ সালের গণহত্যা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ জেনোসাইডের একটি। ১৯৭১ সালে যে ভয়াবহ গণহত্যা হয়েছিল, তা করা হয়েছিলো এই জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যার সব তথ্য-প্রমাণ আমাদের আছে, সেগুলো জেনোসাইডের স্বীকৃতি পাওয়ার সকল শর্ত পূরণ করে। সুতরাং এই জেনোসাইডের স্বীকৃতির জন্য আমাদের দাবি অযৌক্তিক নয়, বরং সময়ের সবচেয়ে যৌক্তিক দাবি। আমাদের মনে রাখতে হবে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দাবির বিষয়টি করুণা ভিক্ষা নয়। গণহত্যা বন্ধ না হলে মানবসভ্যতা বিপর্যস্ত হবে। বিশ্ব বিবেককে এটি অনুধাবন করতে হবে।

#

লেখক: উপসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার